International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-I, July 2015, Page No. 11-20
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

মধ্যযুগের বঙ্গনারী ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রমনীর প্রতিবাদ

ড. সুশান্ত ঘোষ
কলকাতা, ভারত

Abstract

'Naribad is a Bengali literary word which is similar to Feminism of western world. Feminism means granting the same rights of women but it is more about compassion, respect and understanding from the male counter parts. Throughout the world women are deprived of their social and economic rights. Twentieth Century has witnessed a growing awareness among women regarding their desire, sexuality, self-definition, existence and destiny. Women's effort to seek their Independence and self-identity started a revolution all over the world which was termed by analysts and critics as 'Feminism'. Middle age Bengali Literature was mainly dominated by male writers. But some Literatures were created by women writers. Chandravati and Rajakini Rami were great artists and writers in the middle age Bengali Literature. In the Folk culture and folk Literature on that time was enriched by women writers. To change the conventional image of women constructed by orthodox society it is necessary to discourage the habit of defining women as an essence whose nature is determined biologically and whose sole identity is to produce human species. Women's contributions in the Middle Age Bengali Literature are always respectable.

'Feminist' বা 'নারীবাদ' শব্দটি উত্তর আধুনিক সাহিত্য বিচারে পরিচিত নাম। নারীবাদ শব্দটি বিংশ শতকের ষাটের দশকে আমেরিকার বামপন্থী নারীরা তাদের অবস্থান নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, অবশ্য ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে এরও প্রায় দেড়শো বছরের পূর্বে নারীর স্বাধীনচেতনা সত্তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে মেরী উইলস্টোন ক্রাফটের A vindication of the Rights of Women গ্রন্থটির শিরোনামই বলে দেয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অত্যাচারিত দিশেহারা নারী আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উদগ্রীব। অবশ্য আধুনিক নারীবাদের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক তপ্ত তর্ক প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্ন দেখা যায় বইটিতে ততখানি বিপ্লব নেই, তথাপি বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। এই বইটির মধ্যেই নারীবাদী আন্দোলনের পূর্ববীজ উপ্ত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকে একের পর এক ঘটনা প্রমাণ করিয়ে দেয় নারীসমাজ ক্রমশই পুরুষতন্ত্রের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে স্বাধীনভাবে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তৎপর হয়েছে। ১৮৩৭ সালে আমেরিকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম নারীসমাজ সম্মিলিত ভাবে দাসপ্রথা বিরোধী সম্মেলন করে। ফলতঃ নারী তার সংসারের আবর্ত থেকে বৃহৎ প্রতিবাদের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। ১৮৯৩ সালে দীর্ঘ আন্দোলনের পর Suffragette আন্দোলন সাফল্য লাভ করে এবং নিউজিল্যান্ডে প্রথম মহিলারা গণতান্ত্রিক প্রদ্ধতিতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে এবং ভোটদানে সক্ষম হন। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারাজেট কিনের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে নারীদের একত্রিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয় এবং এরই ফলস্বরূপ ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় বিশ্বজুড়ে এরই পাশাপাশি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য সভ্যতার অগ্রণীদেশ ইংল্যান্ডে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে। ফলে পুরুষসমাজের সহযোগী না হয়ে পুরুষসমাজের সমকক্ষত্ব লাভ করল। অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া দরকার ভোটাধিকার লাভ করলেও পুরোপুরি স্বাধীন হবার সুযোগ তাদের ছিলো না। কেননা তখন পর্যন্ত তাদের প্রতিভা ও কর্মের দিকটি পুরুষসমাজের কাছে অবহেলিত থেকে গেছে; অবশেষে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া উলফের A room of one's own প্রকাশিত হয়। লেখিকা বইটিতে নারীর স্বাতন্ত্র্যের নানা রূপ

তুলে ধরলেন এবং স্পষ্ট ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি সরাসরি আঙুল তুললেন। সুযোগের অভাবেই নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে Second Sex বা গৌণ লিঙ্গ তাই লেখিকার দাবী নারীকে নিজস্ব পরিসর দেওয়া হলে তাদের সৃজনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষসমাজের সমান উৎকর্ষ পাবে। যে তিনটি গ্রন্থে নারীবাদী আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছজিল সেগুলি হল ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সিমোন দ্য বোভোয়ারের The Second Sex ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বেটি ফ্রিডানের The Feminine Mystique এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কেট মিলেটের বহুআলোচিত Sexual Politics তিনটি গ্রন্থেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ ও বিষোদগার উদ্গিরিত হয়েছে। এরই পাশাপাশি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্যাট কারবাইন, গ্লোরিয়া স্টিমেম প্রমুখ নারীবাদীরা এম.এস. পত্রিকার প্রকাশ করেন। নারীবাদীদের মুখপাত্র হিসাবে নারীবাদের কথা আমেরিকার নারীদের কাছে তুলে ধরেছিল। সিমোন দ্য বোভেয়ারের The Second Sex গ্রন্থে নারীর নারীত্বের স্বরূপ সুন্দর ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এই স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা থেকে শুরু করে ইতিহাস অর্থনীতির প্রত্যেক কক্ষে ঘুরে ফিরেছেন, তাঁর নঞর্থক রূপে গড়ে উঠেছে। তাই পুরুষসমাজ নারীকে Second Sex বা গৌণ লিঙ্গ বা পুরুষের 'অপর' হিসাবে দেখাতেই অভ্যস্ত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে তাই নারী পুরুষের এত বিভেদ। তিনি মনে করেন এই বিভেদ জ্ঞানের জন্যই পুরুষসমাজের দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে এত বিভেদ। তিনি মনে করেন এই বিভেদ জ্ঞানের জন্যই পুরুষসমাজের দ্বারা অস্বীকার করা হয়েছে নারীর স্বকীয়তা ও তার দায়িত্ব বহনের অধিকারকে। এই বইতে লেখিকার সেই বিখ্যাত উক্তি নারীবাদীদের প্রতিবাদের ভাষা–"কন্যাসন্তান নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী করে তোলে"। কেটি মিলেটের Sexual Politics গ্রন্থে পুরুষতন্ত্রের ধর্ষকামিতার বিরুদ্ধে খোলা গলায় প্রতিবাদ করা হল। তাঁর মতে সাহিত্যেপাতায় পাতায় চরিত্রের চিত্রনের নামে পুরুষ সাহিত্যিকরা বিকৃত নারী চরিত্রের আমদানী করে তাদের চরিত্রের কলঙ্কময় ধর্ষকামীরই পরিচয় দিয়ে চলেছে। তিনি মনে করেন নারীর সজাগবোধকে আমল না দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিকোন থেকে নারীকে নিয়ন্ত্রন করা হচ্ছে। একে তিনি যৌন রাজনীতি বা Sexual Politics বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর এই তপ্ত বক্তব্য সব নারীবাদীকেই জাগিয়ে তুলেছিল। নারীবাদীরা সাহিত্য শিল্পকলায় নারীদের অংশগ্রহণকে চুলচেরা বিশ্লেষন করতে লাগলেন। পুরুষদের রচনায় কীভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার মধ্য থেকেও নারীবাদীরা নারীর প্রকৃত স্বরূপকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। কেননা মেয়েলিসমাজ চিরদিনই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জাঁতাকলে বন্দিনী, পুরুষদের রচনায় নারীত্বের মহৎ মূর্তিটিও কোন কোন সময় পেয়েছে সেখানে এইসব কবি বা শিল্পীরা নারীর শিল্পকর্ম কিংবা সাহিত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন, প্রথম যুগের নারীবাদীরা এইভাবে নারীদের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করতে উদগ্রীব হয়েছিলেন। পরবর্তী নারীবাদীরা কেবল পুরুষদের রচনায় প্রতিফলিত নারীর কথাকে জনসমক্ষে তুলে ধরা নয়, নারীর স্বরচিত শিল্প সাহিত্যের ঐতিহ্যমন্ডিত তালিকাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পুরুষসমাজের কবল থেকে রক্ষা না পেয়ে যে সব নারী সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেছে সেগুলিকেও আধুনিক নারীবাদীরা 'গাইনোক্রিটিক' (Gynocritic) প্রদ্ধতিতে তাদের মূল্যায়নে তৎপর হলেন। নারীরচনার বৈশিষ্ট্যসমূহের একটা তালিকাও তাঁরা নির্দিষ্ট করার কথা ভাবলেন। তাঁদের মতে নারী পুরুষ দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষ দুটি পৃথক শ্রেণীর সংস্কৃতি তথা শিল্পের লালন করে। পুরুষের সংস্কৃতি যদি পুরুষালি সংস্কৃতি হয় তবে নারীর সংস্কৃতিকে মেয়েলি সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। এমন এক মানদণ্ড তাঁরা চাইলেন যাতে দেশ কালাতীত নারীর স্বরূপটি একটি অনুভূতিতে বিকশিত হয়। এক্ষেত্রে তারা প্রাধ্যান্য দিয়েছিলেন নারীর মানসিক বিবর্তন ও অনুভূতির দিকগুলোকে। তাঁদের মতে একজন নারী নারীমনের যে রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে একজন পুরুষের পক্ষে সে রহস্য উদ্ঘাটন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যাট্রিশিরায়ের স্প্যাকস এর The Female Imagination : A Literary and Psychological Investigation of Women's Writing বইতে এরকম ভাবেই নারীসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। নামকরণ থেকেই স্পষ্ট হয় তিনি নারীর মানসিক আচার আচরণ ও অনুভূতির দিকগুলোকেই মানদণ্ড হিসাবে স্থির করেছিলেন। এরপরপরই ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এলেন মোয়েরস Literary Women : The Great Writers নামের একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশ করলেন তিনি। এতে তিনি বলেছেন নারীর জৈব শরীর এবং তাদের সামাজিক অবস্থান এর জন্যেই পুরুষদের রচনা থেকে তাদের রচনা পৃথক হয়ে যায়। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি ট্রাজেডি ও গথিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর মতে পুরুষের বীর্যের পতন ট্রাজেডির সঙ্গে মেয়েদের গথিক উপন্যাসের বিস্তর প্রভেদ চোখে পড়বে। ট্রাজেডির মতো গথিক উপন্যাস পাঠক মনে ভীতি ও করুনার উদ্রেক করেনা 'বরং এও চমক জাগিয়ে তোলে'। নারীর রচনার মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের ছবি ও সমাজ পরিবেশে তাদের দুরাবস্থার ছবিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ এমিলি ব্রন্টি, মেরি শেলি, ক্রিশ্চিনা রসেটির নাম স্মরণ করেছেন তিনি কেননা এইসব মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীর গার্হস্থ্য জীবন আকাঙ্খা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভয় ভীতি আতঙ্কের দিকগুলো উজ্জ্বল ফুটে উঠেছে। কিন্তু মোয়েরস্ কিংবা

স্প্যাকস কারো বক্তব্যই ইতিহাস সম্মত বাস্তবগ্রাহ্য হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি, সেদিক থেকে শোওআল্টারই প্রথম যথার্থভাবে নারীসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার অবকাশ পায়। তিনি দেশকাল নিরপেক্ষতার বদলে নির্দ্দিষ্ট দেশ কালের প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিলেন এবং নারীর আত্মচেতনার বিষয়টিও গুরুত্ব পেল তাঁর কাছে। ফলে বিশেষ কোন জাতির নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক সংস্কৃতি দেশ কালের সঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। তিনি নারী সংস্কৃতির বিবর্তনের তিনটি ধাপ বা পর্যায়ের কথা বলেছিলেন – যথা (i) Feminine (ii) Feminist (iii) Female.

ক। প্রথম পর্যায়ে আধিপত্যকারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা বিষয়গুলি অনুকরন করতে সচেষ্ট হয়।

খ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে প্রতিবাদ; প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ;

গ। তৃতীয় পর্যায়ে নারী তাঁর আত্মআবিষ্কার করে পরনির্ভরতা কাটিয়ে স্বাধীন হয়ে উঠছে। তিনি কালানুক্রমিক বিন্যাসেও এই বিবর্তনটিকে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ১৮৪০-১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম পর্যায়ে, ১৮৮০-১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায় এবং ১৯২০ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর গিলবার্ট ও সুসান গুবার নারীবাদের স্বপক্ষে ধারণা গড়ে তোলেন। তারা বললেন সমাজ যেহেতু পুরুষশাসিত তাই শিল্পের সংজ্ঞাও নির্নীত হয় পুরুষের দ্বারাই। নারীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গৃহে বন্দী করা হয়েছে তার কাছে সমাজের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে অধীনতা আর নিষ্ক্রিয়তা। সাহিত্য শিল্পের সংজ্ঞা পুরুষ নির্নীত বলেই নারীর শিল্পকলা যথার্থ বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। নারীর রচনায় নারীর সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক সীমাবদ্ধতা থেকে বন্ধনমুক্তির প্রসঙ্গগুলি ফিরে আসবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। এইভাবেই নারীবাদী ধারণা আজও নতুনভাবে এগিয়ে চলেছে।

বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্য আমরা দুভাবে প্রাপ্ত হয়েছি। যথা – লিখিত সাহিত্য ও মৌখিক সাহিত্য। মধ্যযুগে প্রাপ্ত সব লিখিত সাহিত্যিই পুরুষ কবিদের রচনা। সেখানে মেয়েদের লিখিত সাহিত্য বলতে চন্দ্রাবতীর রামায়ন'ই একমাত্র নিদর্শন। লিখিত সাহিত্যের পরিধিটা ছেড়ে দিলে অলিখিত সাহিত্য বা লোকসাহিত্যের বিপুল ভান্ডারটি নারীর নিজস্ব সৃষ্টি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই নারীবাদী ধারণায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

(ক) মধ্যযুগে যেহেতু নারীর লিখিত সাহিত্য পাওয়া যায় না তাই অলিখিত লৌকিক সাহিত্যে নারীর অবস্থানটিকে স্পষ্ট করা।

(খ) মধ্যযুগে পুরুষ কবিদের রচনায় প্রতিফলিত নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা এবং আত্মগোপন করে থাকা নারী সাহিত্যের পুনরুদ্ধার করা।

(গ) সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকলার দিকটিও বিশ্লেষণ করে নারীর অবস্থানকে সূচিহ্নিত করা।

মধ্যযুগের সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার পূর্বের মধ্যযুগে নারীর অবস্থানটি স্পষ্ট করা দরকার।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী চিরকালই অবহেলিত। প্রাচীনকাল থেকেই নারীকে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে। মনুসংহিতা, মহাভারতের 'অনুশাসন' পর্বে নারীকে পুরুষের অধীন করার নানা প্রয়াস দেখা যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নারীর যথার্থ অবস্থানটি স্পষ্ট অনুধাবন করা না গেলেও আদি মধ্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রাধা পুরুষ শাসিত সমাজে অসহায় রূপে বিরাজ করেছে। 'বানখন্ডে' রাধাকে কৃষ্ণ মন্মথবান নিক্ষেপ করে তাকে মূর্চ্ছিতা করলেন, রাধা অনেক মিনতি করলেন কিন্তু কৃষ্ণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি তাকে আমল দেবে কেন, রাধা তো তার কাছে কেবল প্রয়োজনের তার মানসিক প্রকাশ ও বিকাশ সে চায়না, অর্থাৎ মধ্যযুগে নারী ছিল গৃহকোনে আবদ্ধ; তাই তারা তাদের ছোট পরিধির মধ্যে থাকতে থাকতে মনের ভাবনাকে কখন যেন প্রকাশ করে ফেলেছে ছড়ায়, গানে, ধাঁধায়, প্রবাদে; আলপনায়, নকসীকাঁথায়। মধ্যযুগে নারীর লিখিত পাঁচালি না পাওয়া গেলেও এগুলিই তাদের জীবন পাঁচালি হয়ে উঠেছিল। তবে একথা সত্যি যে নারীরা কাব্য চর্চাও করত মধ্যযুগে তবে পুরুষসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অনধিকার প্রবেশ স্বীকৃত হয়নি তাই কালের নিয়মে হারিয়ে গেছে তারা। পাশ্চাত্য নারীবাদীরা 'হারিয়ে যাওয়া' নারী সাহিত্যের পুনরুদ্ধারে উৎসাহী হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের 'বংশীখন্ডের' এই অংশটি পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় এ এক হারিয়ে যাওয়া সাহিত্যের অংশ।

"কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়াই এ গোঠ গোকুরে।।
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশির শবদে মোঁ আউলাইল রন্ধন।।
কে না বাঁশি বড়ায়ি সে না কোন জনা।

দাসী হ আঁ তার পাত্র নিশিবোঁ আপনা।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাত্র বড়ায়ি মোঁ কৈলা কোন দোষে।।
আঝর ঝরত্র মোর নয়নের পানী।
বাঁশির শবদে বড়ায়ি হারাই লোঁ পরানী।।
আকুল করিতেঁ কিবা আক্ষার মন।
বাজাএ সুন্দর বাঁশী নান্দেন্নন্দন।।
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পরি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিঅ লুকাওঁ।।
বন পোড়ে আগে বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী।।
আন্তর সুখাত্র মোর কাহ্ন অভিলাসে"।

এতে নারীর যে আন্তরিক মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে তা কোন পুরুষ কবির রচনা হতে পারে না। আমাদের মনে হয় নারীর রচিত সাহিত্যই এখানে আত্মগোপন করে আছে। সমালোচক গিলবার্ট নারীর লেখার মধ্যে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা এবং বন্ধন মোচনের প্রসঙ্গ সাধারণভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। এখানেও সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং বন্ধন মোচনের তীব্র আকাঙ্খা, লিঙ্গ বক্তব্যের দিক থেকে যে নারীর ভাবনা তা খুব সহজেই ধরা যাবে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বহু অংশ আছে যা নিবিড় ভাবে পাঠ করলে অনায়াসেই ধরা যায় নারীই তার সৃষ্টিকর্ত্রী। পুরুষ লিঙ্গের কাছে উপেক্ষিত হয়ে সেই সব অলিখিত সাহিত্য কখন হারিয়ে গেছে কিছু হয়ত অজান্তেই পরিবর্তিত হয়ে এই সব পুরুষ কবির লিখিত সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু প্রমানের উপাদানের বড় অভাবের জন্য নারীর আকাঙ্খা, চাওয়া, পাওয়া, সংসার চক্রের অভিজ্ঞতা ও মানসিক দিকগুলিই বুঝে নিতে হবে। মেয়েলি রচনায় ঘর সংসারের একটা গভীর আন্তরিকতা দেখা যায় - যা পুরুষদের কাছে অভিজ্ঞতাহীন। তেমনি 'রাধাবিরহ' খন্ডে যখন রাধা বলেন—

"এধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার
চিন্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার"।

তখন স্পষ্ট বোঝা যায় এ আপেক্ষ উক্তি নারীর রচনা। কেননা যে সমাজে পুরুষ বহুবিবাহ করতে পারত, যে সমাজে ধন সম্পত্তির কৌলীন্য ছিল, সেই সমাজে পুরুষ কবির মুখদিয়ে ধন, যৌবনের অসারতা বেরিয়ে আসতে পারে না। নারীই বোঝে তার যথার্থ বেদনা। স্বামীর বা প্রেমিকের ভালোবাসা ছাড়া পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সবই অসার। তাই আমরা বিশ্বাস করি এ জাতীয় পঙক্তির অন্তরালে হয়ত কোন মহিলা কবির অলিখিত বেদনাই পুরুষ কবির হাতে লিখিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে জয়দেব কিংবা পদাবলীর চণ্ডীদাসের রাধার বেদনা তাদের সঙ্গিনীর বেদনাজাত বলে মনে হয়। কেননা জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী আর চণ্ডীদাসের সাধন সঙ্গিনী রামী দু'জনেই পদ রচনায় কবিদের সাহায্য করেছিল প্রেরণা যুগিয়েছিল। কে জানে চণ্ডীদাসের রাধার কাতরোক্তি তাঁর সঙ্গিনীর হাতে রচিত হয়েছিল কিনা! 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কবি যে 'প্রবাদ ব্যবহার করেছেন তা নিজের সৃষ্টি নয় কেননা প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্টধারা আর লোকসাহিত্য সংহত সমাজের সৃষ্টি। ফলতঃ যে প্রবাদ লিখিত হয়েছে তা সংহত সমাজে প্রচলিত ছিল, এবং সেই সমাজ ছিল নারী সমাজ। কেননা প্রবাদের মধ্যে মূর্ত হয়েছে নারীর বাসনা, কামনা, অভিযোগ, অনুশোচনা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আছে—

(১) "সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপত্রি জুড়িএ আগুন তাপ
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বানে"।

কিংবা

(২) "যে ডালে করো মো ভরে
সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে"।

স্পষ্ট বোঝা যায় এ কোন পুরুষের রচনা নয়। কেননা পুরুষের মুখ দিয়ে পুরুষের স্নেহ ভাঙার কথার এত বেদনাঘন রূপ রচিত হতে পারে না। নারীই জানে পুরুষের ভালোবাসা একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া সম্ভব নয়? বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা অধ্যুষিত সমাজে দাঁড়িয়ে এ উক্তি একবারেই নারী অভিজ্ঞতা সঞ্জাত তাই মনে হয় এই প্রবাদ নারীর সৃষ্টি, বড়ু তাঁর কাব্যে

একে গ্রন্থিত করেছেন মাত্র। এরকম বহু নারী সাহিত্যের উপাদান ছড়িয়ে আছে আদি মধ্য বাঙলা সাহিত্যে। তাই নারীবাদী সমালোচকেরা ঠিকই বলেছিলেন, পুরুষ কবিদের রচনায় নারীর হারিয়ে যাওয়ার লেখা আত্মগোপন করে আছে। নারীর অবদানকে যথার্থ রূপে খুঁজে পেতে হলে সেগুলি অন্বেষণ করা দরকার।

মঙ্গল কাব্য গুলিতে নারী স্বমহিমায় বিরাজিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশের সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে নারী চরিত্র গুলিতে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারীর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য রোমান্টিক সাহিত্য। মূলতঃ রাধার কথাই বৈষ্ণব কবিদের উপজীব্য। রাধার চরিত্র আঁকতে গিয়ে বৈষ্ণব পদকারেরা নারীর আবেগ অনুভূতি, প্রকাশকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির কবিরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় নারীকে দেখেই কেবলমাত্র এছবি আঁকা সম্ভব ছিল না। মনে হয় বৈষ্ণব পদাবলির কবিতার ছত্রে ছত্রে নারীর যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা কেবলমাত্র নারীর পক্ষেই বোঝা ও প্রকাশ করা সম্ভব। তাই মনে হয় এই সব অনুভূতির কাব্যমালা গাঁথতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিরা নিশ্চয়ই নারীর সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মানসলোকে তারপর নারীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত কোন চকিত মুহূর্তের কাব্যমালা বৈষ্ণব কবিতায় আত্মগোপন করে আছে; চৈতন্যপূর্ব থেকে চৈতন্যপরবর্তী সব বৈষ্ণব সমাজেই নারীসাধিকা ছিল, কবিরা যে তাদের কাছ থেকে কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেনি - এটা ঠিক নয়। স্বয়ং চণ্ডীদাস তার সাধন সঙ্গিনী রামীর নাম তাঁর পদে উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন সেকথা। বিদ্যাপতির মতো সৃষ্টিরহস্যভেদী কল্পনার মানুষও লছিমা দেবীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। মধ্যযুগের রাজা বা রানীদের কবি বা শিল্পীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেবার পিছনেও থাকত একধরনের উদ্দেশ্য, তাদের কাব্যের মধ্যে তাঁরা আপনার কীর্তনমহিমা শুনতে চাইতেন। ফলে অনেক উপাদানও রানীর অন্দরমহল থেকে জানতে হত তাদের যা হয়ত একান্ত ভাবেই নারীর সৃষ্টি। বৈষ্ণব পদাবলির অজস্র উপমা, প্রবাদ, বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে এগুলি পুরুষের সৃষ্টি নয়। লেখার লিপিতে পুরুষ কবির নামে লিপিবদ্ধ হলেও তা আসলে নারী সমাজের সৃষ্টি। চণ্ডীদাসের রাধা যখন যন্ত্রনাকাতর হৃদয়আর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে এইসব উপমা ব্যবহার করেন—

(ক) পিরীতি আঠা ননদী কাঁটা
পড়শী হইল ফাঁসি।
(খ) কলসে কলসে ছিঁচে না ঘুচে পাথার
(গ) ননদিনী দেখে চোখের বালি
(ঘ) ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা

স্পষ্ট বোঝা যা এ উপমা নারীর অভিজ্ঞতাজাত নারী সমাজেই স্বরূপ বেশি করে চেনা। ননদিনীর অত্যাচারের চিত্র আমরা বিভিন্ন কাব্যে পাই তা থেকে বোঝা যায় ননদিনীর অত্যাচারের অতিষ্ঠ কোন বৌ মনে মনে লিখে ফেলেছিল একথা পরে বহুপ্রচলিত হয়ে পুরুষ কবির রচনায় পাকাপাকি ভাবে স্থান করে নিয়েছে। কলসীর মতো নারীর নিত্যব্যবহার্য বস্তুর উল্লেখেও বোঝা যায় উপমার ভাবনাটি নারীর কাছ থেকেই আগত। এভাবে দেখা যায় কেবল মাত্র পুরুষ কবিরাই যে সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন সেকথা সঠিক নয়। কেননা নারীর প্রকাশেও ইচ্ছা থাকলেও প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল খুবই সংকীর্ণ। পুরুষ সমাজ সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রবেশ করাকে অনধিকার চর্চা মনে করতেন তাই মৌখিক সাহিত্যেই তারা প্রকাশ করেছে নিজেদের। বৈষ্ণব পদাবলির অন্যান্য কবিদের কবিতার বহু অংশ বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যাবে নারীর আবেগ-অনুভূতি যে রূপ প্রকাশিত হয়েছে তা কোন নারীর সৃষ্টির পথ ধরেই এসেছে বলে মনে হবে। বিশেষ করে বাল্যলীলা পর্যায়ের পদে মা ও সন্তানের যে পারস্পরিক আন্তরিকতার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় সেখানে আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন বেশি করে পাওয়া যাবে। জ্ঞানদাসের রাধা যখন চণ্ডীদাসের রাধার মতো বলেন—

"চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব"

কিংবা বিদ্যাপতির রাধা যখন বলেন—

"বড় দুখ রহুল মরমে
পিয়া কিছুরল যদি কি আর জীবনে
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে"

তখন যে মানসিকতা ফুটে ওঠে তা কেবলমাত্র নারীর অনুভূতি জাত। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম নারী মনস্তত্ত্বের ছবি প্রকাশ পেয়েছে তা কেবল নারীর পক্ষেই যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। পূর্ব জন্মের কর্ম ফলে নারীর প্রিয় নারীকে ত্যাগ করেছে কিংবা চিতার আগুনের প্রসঙ্গ সত্যিই নারী সৃষ্টির প্রসঙ্গ ধরে এসেছে বলেই মনে হবে। কেননা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেখানে

নারীর অবস্থানকে অস্বীকার করে, সেখানে জন্ম নিয়ে কোন কবি নারীর বেদনার এত নিখুঁত ছবি আঁকতে পারেন না, যদি না নারীই সেই বেদনাকে প্রকাশ করে। 'ছড়া' লোকসাহিত্যের অন্যতম মুখ্য অংশ। এই 'ছড়া' অলিখিত এবং মুখে মুখে সমগ্র নারীসমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে। ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই সব ছড়া কোনো নারী সৃষ্টি করেছিল তার সংসার পালনের অভিজ্ঞতা থেকে। নারীর সন্তান পালনের অভিজ্ঞতা কিংবা সাংসারিক নানা বিষয় এই সব ছড়ার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নারীর সাংসারিক ও লৌকিক নিয়ম ছড়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে 'ছড়া' সৃষ্টির পিছনে নারীর প্রয়োজন বোধকে স্বীকার করেছেন। নারী তার বৃহৎ সংসার পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান পালন করত; সন্তানকে ভুলিয়ে রাখার জন্য সে সুর করে একটা ছড়া আবৃত্তি করত। শিশুর মনে সেই সুর জেগে উঠত, সে চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ত। এই সব ছড়া তার জীবনচর্চার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছে। কেবল ছেলেভুলানো ছড়া নয়, ব্রত উৎসব উপলক্ষেও মেয়েরা তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা থেকে ছড়া তৈরী করেছে; সেগুলোর কোন কোনটি আজও নারীসমাজে বেঁচে রয়েছে; নারীহৃদয়ের বিমূর্ত ধারণা মূর্ত হয়েছে আলপনা, কিংবা সূচীশিল্পেও। মধ্যযুগে নারীরা কেমন আলপনা দিত তার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় না পাওয়া গেলেও পুরুষ কবিদের রচনার মধ্যে নারীর আলপনা দেওয়ার একটা পরিচয় মাঝে মাঝেই আমরা পেয়ে থাকি। এইসব আলপনা বা সূচিশিল্পও লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত। তাই মনে হয় মধ্যযুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপে নারী লিখিত কোন সাহিত্য রচনা করতে সক্ষম না হলেও তারা একেবারে নীরব ছিলেন একথা ঠিক নয়। 'ছড়া' যে একান্তভাবেই মধ্যযুগীয় বঙ্গনারীর অবদান তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। দামাল শিশুকে হাজার কাজের মধ্যে ঘুমপাড়ানো একটা বড় ব্যাপার প্রত্যেক মায়ের কাছে। মা তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে সুরের মূর্চ্ছনায় শিশু ঘুমিয়ে পড়ে তাই তখন সে 'ছড়া' বেধেছে—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেও।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও।।
ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে ঘুসে লতা পাতা।
দু'দুয়োরে ঘুম যায় দুটি মোগল পাতা।।
হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায় দুধের কুমারী।।

পরিস্কার বোঝা যায় এ ছাড়া কোন পুরুষের হতে পারে না। কেননা শিশুকে ঘুমপাড়ানোর দায়িত্ব আজও মায়ের উপরই বর্তায়। হেঁসেল এবং পান দেওয়ার উল্লেখও নারী অভিজ্ঞতার সূত্র ধরেই এসেছে; মা যে হেঁসেলে কাজের মধ্যেই শিশুটিকে ঘুম পাড়াতে চান তা বেশ বোঝা যায়।

এই শিশু ভোলানো ছড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে পুরুষ সমাজের মতো নারী সমাজও অভিজাত এবং দরিদ্র দুই ধরনের ছিল। অভিজাত শ্রেণীর কামনা চাওয়া পাওয়ার স্তর দরিদ্রের থেকে আলাদা বলেই উভয়ের সৃষ্ট ছেলে ভোলানো ছড়াও দুই ধরনের হয়ে গেছে। এক ধনী অভিজাত মা শিশুকে আদর করছেন এইভাবে—

"ধন গেছে গো বেড়াতে।
পায়ের নুপুর হারাতে।।
যাকগে নুপুর হারিয়ে।
আবার দেব গড়িয়ে।।
আয়রে গোপাল ঘরে আয়।
আওটানো দুধ জুড়িয়ে যায়"।।

এরই পাশাপাশি একজন সাধারণ দরিদ্র মা সন্তানকে আদর করছেন এইভাবে—

ধন ধোনা ধন ধোনা।
চোত বোশেখের বোনা।।
ধন বর্ষাকালের ছাতা।
জাড় কারের কাঁথা।।
ধন চুলবাঁধবার দড়ি।
হুমকো দেবার নড়ি।।

অভিজাত মায়ের কাছে মূল্যবান নূপুর হারানো কোন যন্ত্রনার নয়, কিন্তু দরিদ্র মা চায় সন্তানের একটু স্বচ্ছল জীবন। মধ্যযুগে মেয়েরা নানা মেয়েলি ব্রত পালন করতেন, সেইসব ব্রত উপলক্ষে ছড়া রচনা করত তারা। 'সেঁজুতি' ব্রতে বাংলার কুমারীরা আজও আবৃত্তি করে থাকে এই ছড়াটি—

"দোলায় আসি দোলায় যাই।
সোনার দর্পনে মুখ চাই।।
বাপের বাড়ির দোলাখানি।
শ্বশুর বাড়ি যায়।।
আসতে যেতে দোলাখানি।
ঘৃত মধু খায়।।
কোঁড়ার শাথায় ঢালি মৌ।
আমি যেন হই রাজার বউ।।
কোঁড়ার মাথায় ঢালি চিনি।
আমি যেন হই রাজার রানী"।।

এই ছড়াটির মধ্যে নারীর একটি গোপন প্রার্থনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল স্বামীগৃহ যেন সম্পদশালী সুখ সমৃদ্ধিতে ভরা থাকে। এ কেবল কোন একক নারীর প্রার্থনা নয়, অনাদিকালের প্রত্যেক কুমারীরই একান্ত প্রার্থনা; 'তোষলা' ব্রতের মধ্যেও নারীর এই বাসনাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে—

"তোমার কাছে মাগি এই বর
স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে করি ঘর"।

এভাবে দেখা যায় কুমারী মেয়েদের পাশাপাশি সধবা ও বিধবারাও তাদের কামনা বাসনা, দুঃখ বেদনার কাহিনী দিয়ে সৃষ্টি করেছিল নানা ব্রতের পাশাপাশি নানা প্রকার প্রবাদও তৈরী করেছে নারীসমাজ; প্রবাদগুলির আবেদন একান্তভাবেই সামজিক ও মানস্তাত্ত্বিক। প্রত্যেকটি প্রবাদের মধ্যেই মিশে আছে নারীর দুর্মর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। যেমন ---

"ননদিনী রায় বাঘিনী দাঁড়িয়ে আছে টিক সোজা"।

মধ্যযুগের সাহিত্যে ননদিনী যে চরিত্র পাই তা থেকে বোঝা যায় এয়োতী নারীর কাছে ননদিনী ছিল একটা শক্ত দেওয়াল; তাকে অতিক্রম করা বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সম্ভব ছিলনা তাই এই প্রবাদ তৈরী করেছিল এয়োতী নারী। অন্যদিকে বউকে স্বামীর অপরিমিত সোহাগ সহ্য করা সম্ভব ছিল না ননদ কিংবা শ্বাশুড়ীর তাই তারাও প্রবাদ সৃষ্টি করল।

"আদুরে বউ নেংটা হয়ে নাচে"।

এই সব প্রবাদের মধ্যদিয়ে নারীরা মানসিকতার বিচিত্র স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে আছে। প্রবাদ গুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এ কোন নারীর সৃষ্টি কোন পুরুষের সৃষ্টি নয়।

মধ্যযুগের সমাজে নারীর প্রতিবাদের কোন স্থান ছিল না কিন্তু প্রতিবাদ ছিল। পুরুষ কবিদের রচনায় তার প্রমাণ সংলক্ষ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাস রাধার চরিত্রে এনেছেন প্রতিবাদের ভাষা।

বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলের প্রধান সুরই প্রতিবাদের। নারায়ণদেবের ক্রুদ্ধ চক্রান্তলোভী মনসাও যে প্রতিবাদ করেছে তার মধ্যে পুরুষতন্ত্রের প্রতি নারীর অসহিষ্ণুতাই সুপ্রকাশিত।

বেহুলার স্বর্গযাত্রা আসলে পুরুষতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে নারীর প্রতিবাদ ভিন্নমাত্রায় প্রকাশিত। নারীদরদী এই কবি যেখানেই নারীর দুঃখ, যন্ত্রণার কথা বলেছেন সেখানেই প্রতিবাদের ভাষা প্রচ্ছন্ন বা প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দেবখণ্ড বা নরখণ্ড সর্বত্রই এই প্রতিবাদের ছায়াপাত ঘটেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌরী প্রতিবাদ করেছে স্বামীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে। বিনা নিমন্ত্রনে নারী পিতৃগৃহে গেলে স্বামীর অপমান অনিবার্য। তবু গৌরী শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করার যুক্তি দেয়—

ভবানী বলেন যাব বাপের সদন
ইথে দোষ নাহি নাথ লোকের গঞ্জন।"

এখানে প্রচ্ছন্ন হলেও স্বামীর বক্তব্যকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা আছে। এ এক ধরনের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। যার প্রমাণ আমরা পাই শিবের নিষেধ অমান্য করার অসীম দুঃসাহসীকতায়।

যাইবার অনুমতি নাহি দিল পশুপতি
দাক্ষায়নী হইল কোপবতী।।
সক্রোধ হইয়া বামা চলিল ভ্রুকুটি ভীমা
একাকিনী বাপের বসতি।।
হইয়া উন্মুক্তবেশা যান দেবী মুক্তকেশী
না শুনিয়া শিবের বচন।।

শিব গৌরীর স্বামী। পতিপরায়ণতাই নারীর একমাত্র ধ্যান। তবে তাকে অবজ্ঞা করে কেমন করে? মনে হয় গৌরী প্রতিবাদ করেছিল শিবকে নয়, তার আদেশকে। কেননা নারী স্বাধীনতা চায়, সমাজ তাকে দেয়না, তাই নারী গর্জে ওঠে সেই সমাজের প্রতি। বিপরীত দিকে গৌরী বিনা আমন্ত্রনে এসে প্রতিবাদই করেছে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে। কেননা গৌরীর বাবা জেনে শুনেই কুলীন পাত্র শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, অথচ সামাজিক আভিজাত্যের মোহে তাকে ভুলে যায় দক্ষ। কন্যা গৌরী তো নির্দোষী তবে কেন আমন্ত্রন করা হবে না উৎসবের অনুষ্ঠানে। বিনা আমন্ত্রণে এসে সে দক্ষের চক্ষু খুলে দিতে চেয়েছে। একে সার্থকতম নারী প্রতিবাদের নমুনা বলে গ্রহণ করা চলে।

অন্যদিকে স্বামীর অপমানের প্রতিবাদের ভাষাও তীক্ষ্ম। সব কন্যার স্বামী পূজা পেয়েছে অথচ শুধু গৌরীর স্বামী পায়নি এজন্য তার অভিমান জন্মেছে মনে। সেই অভিমানে মিশে আছে প্রতিবাদের তীব্র ভাষা—

"না দেখিয়া যজ্ঞে শিবের পূজা।
কোপে কম্পমান তনু বাপে জিজ্ঞাসন।।
শুন বাপা তোমারে করে যে অভিমান।
সতী ঝিয়ে কেন তুমি টুটাইলে প্রাণ।।
ধর্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুজন।
সবারে আসিতে যজ্ঞে দিলা মন্ত্রণ।।
শিবের মন্ত্রণ বাপা নাহি দিলে কেনে।
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়নে।।
অন্য জামাতারে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব পরে ভালো নহে তোমার ব্যাভার।।
দুষ্ট দৈব্য গ্রহ ফলে আমি তোমার ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম নিবেদিব কি।।

এর মধ্যে অভিমান যাই তাক তার চেয়ে বেশি পরিমানে যে প্রতিবাদের যে রক্তচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে তা পাঠ করলেই ধরা যাবে। যার চূড়ান্ত রূপ পেছেছে সতীর আত্মহত্যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও নিয়মানুশাসনের বিরুদ্ধে নারী প্রতিবাদ।

"শিবনিন্দা শ্রবণেকরির প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর।।
যেই স্থান ছাড়ি কিংবা যাই অন্যস্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু তেজিয়া পরান।।

প্রতিকারের অভিমান সে জীবন দান করেছে। এ কথাই প্রমাণ করে প্রতিবাদের ভাষা কতটা তীক্ষ্ম ছিল। গৌরীর মৃত্যুতে তার মা মেনকাও হয়েছে প্রতিবাদিনী। শোকের মাঝেই স্বামীর এই কুৎসিৎ আচরণের নিন্দা করেছে—

দারুণ তোমার বাপ দিল তুমায় বহু তাপ
তেঞ্জি ঝিয়ে তেজিলা জীবন।।

এই প্রতিবাদেই ভিন্নরূপে আছে গৌরীর বিবাহে ব্রাঘ্যচর্মধারী ভিখারী, সর্পভূষণ শিবের দর্শনে—

হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পাদক।
বাপ হইয়া মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।।

এয়োরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়েছে। পুরুষের নিয়মানুশাসনের চেয়ে জীবনের মূল্য বড়ো বলে মনে হয়েছে তারাই অভিসম্পাত করেছে কন্যার বাপকে—

"চক্ষু থাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি"

কৌলীন্য প্রথার যে কি বিষময় ফল হয় তার প্রমাণ আছে "নারীগণের পতিনিন্দা" অংশ। "নারীগণের পতিনিন্দা" প্রতিবাদের মুখরতায় বাঙময়। স্বামীনিন্দা শ্রবণ করেই দেহত্যাগ করেছিল সতী। অথচ এই অংশে নারীরাই স্বামীর নিন্দায় হয়েছে মুখর। আসলে কুলীন এই সব নারীদের মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন বেদনা ও সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা। তাকেই বাইরে এনেছেন কবি। স্বামীকে বন্যজন্তুর সঙ্গে তুলনায় নারীর প্রতিবাদের রূপটি অন্যচেহারা নেয়—

"আর যুবতী বলে সখী মোর পতি কালা,
আনের হল্য ঘরকন্না মোর হল্য জ্বালা।।
দিনের ঠারে ঠোর কহিপতির সনে।
রাত্রি হইল নিদ্রা যাই গড়ুর শয়নে।।

সংসারে মা মেয়ের সম্পর্ক মিলনের। কিন্তু সামাজিকতা যেখানে হয়ে ওঠে অসহ্য সেখানে মা ও মেয়ের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। পুরুষতান্ত্রিক, লিঙ্গশাসিত সমাজে স্বামীর প্রতি খড়্গ হস্ত হয় স্ত্রী। - এও এক ধরণের নারী প্রতিবাদ।

তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মাজিল গিরিয়াল
ঘর জামাই রাখিয়া পুষিব কতকাল?

স্বামীর ঘরই নারীদের নিজের ঘর। শত দারিদ্র অসহায়তা থাকলেও স্বামীগৃহই নারীর একান্ত কাম্য। পিতৃগৃহে মা কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে সমস্ত দুঃখ বেদনাকে সহ্য করার সংকল্প গ্রহণ করে গৌরী। স্বামী শঙ্করকে ভিক্ষাবৃত্তি করার যুক্তি দেন। স্বামীও সম্মতি দেয় তাতে। বাপের রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করার মধ্যে নারীমনের এক অসীম প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামীগৃহে ভিক্ষালব্ধ সংসার চলে গৌরীর। অভাব অনটন, তার নিত্যসঙ্গী। তার উপরে দুই সন্তানের পোষ্যজন্তুর উপদ্রব অসহায় গৌরীকে আরও বিপদে ফেলে। চালচুলো হীন সংসারে যেখানে একমুঠো অন্নের যোগান নেই সেখানে শঙ্করের বিবিধ ব্যঞ্জন রান্না করার তালিকা শুনে স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গৌরী। স্বামীর অবিবেচকী মনভাবের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণার সঞ্চার করে তীব্র ভাষায় প্রকাশ হয়ে পড়ে তার প্রতিবাদ—

রন্ধন করিতে ভালো বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব তাই ঘরে নাই।।
আজিকার মতো বান্ধা দেহ শূল।
তবে যে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল।।

'গৌরীর খেদ' অংশে গৌরীর অপেক্ষা উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। দীর্গদিন ধরে অসহায় নারীর মনে জমে থাকা প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশমাত্র। অর্থনৈতিক দারিদ্র তো আছেই সেই সঙ্গে কৌলিন্য প্রথার চাপে নষ্ট নারীর উপযুক্ত পাত্রস্থ হতে না পারার বেদনাও কম নয়। ছাপোষা মা পুত্রের পালিত জানোয়ারের কর্মে নজর দিতে না পারলে কুটুক্তি শুনতে হয় স্বামীর দ্বারা। সন্তান পালনে নারী পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য বর্তমান। পিতা যদি নজর দিতে না পারে তাহলে সেটা দোষের নয়। অথচ মা সততই অপরাধী-এই অনিয়ম পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ক্ষতচিহ্ন মাত্র। এর প্রতিবাদ যে অবলা নারীদের মনে জাগরূপ ছিল— তা বোঝা যায় গৌরীর কথায়। সুখী স্বচ্ছল জীবন প্রত্যেক বিবাহিতা রমণীর-ই কাম্য। অথচ প্রবল দারিদ্র সেই কামনাকে বিচ্যুত করে পুরুষের প্রতি নারীর প্রেম যেন সহসাই কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। তাই গৌরী আক্ষেপ করে জানিয়ে দেয় চরম সত্য কথাটি— "মিথ্যা নারী করিয়া মোরে সৃজিলা বিধাতা"

নারীসমাজ পুরুষের নিয়মানুশাসনে বন্দিনী। সতীদাহ প্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সতীদাহকে ছায়া বিশ্বাসের মতই মেনে নিয়েছে, সমর্থন করেনি মন থেকে। নারীর বেঁচে থাকার আকাঙ্খা থাকত। কিন্তু পুরুষ সমাজই তাকে বাধ্য করত এমন কার্যে।

তাই ছায়া (চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নীলাম্বরের স্ত্রী) বিধবার করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন—

"যৌবনে মরন কাল / হৃদয়ে রহিল সাল / নাহি মানে প্রবোধ পরানে
কুলশীল রূপগুনে / জীবন যৌবন ধনে / বিধবার সকলি বিফল।।"

এর মধ্যে নারীর দারিদ্রপূর্ণ অতৃপ্ত হৃদয়ের ক্রন্দনই ফুটে উঠেছে। এও একধরণের প্রতিবাদ।

অন্যদিকে দারিদ্রপূর্ণ সংসারও নারীর অকাম্য। কিন্তু সুখ চাইলেই নারী-তা পেতে পারেনি। তাই বিধাতার প্রতি নারীর প্রতিবাদ ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। শূন্যহাতে শিকার থেকে ফেরা কালকেতুকে দেখে ফুল্লরা খেদ করে—

"বিধবা আমারে দণ্ডী
জীয়তে স্বামীতে রাণ্ডী
কৈল দৈব দুঃখের ভাজন।"

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর গৌণতা লক্ষণীয়। এক পুরুষ একাধিক দার গ্রহণ করতে পারে অথচ নারী কোন স্থানে একরাত্রি কাটালে সে সমাজের চোখে কলঙ্কিনী ও দোষী সাব্যস্ত হয়। এই ঘৃণ ধরা সমাজে নারীর স্থান যে কোথায় তা ফুল্লরা ভালো করেই জানে তাই ফুল্লরা ছদ্মবেশী চণ্ডীকে জানায় সেকথা—

"অধম অবলা জাতি
যদি থাকে একরাতি
পরের ভবনে কদাচিৎ
ছলধরে বন্ধুজন
লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে অনুচিৎ।।

এর মধ্যে ফুল্লরা স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন বিজারিত, কিন্তু এই বক্তব্য স্পষ্ট দেখিয়ে দেয় নারীর জীবনচর্চার অসহায় রূপটিকে। এই উদাহরণ প্রয়োগ প্রচ্ছন্ন হলেও প্রতিবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন।

সতীন সমস্যায় জর্জরিত তৎকালে নারী স্বভাবতই ভয়াতুর থাকত যদি স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করে। নারীর কাছে স্বামীর ভালোবাসাই একমাত্র অলঙ্কার। তাই ছদ্মবেশী চণ্ডীকে সতীন ভেবে স্বামীর প্রতি যে বিষোদগার করেছে ফুল্লরা, তা শুধু তার স্বামীর প্রতি প্রতিবাদই নয় তার কার্যের প্রতি ঘৃণা পোষণও বটে।

পিপীড়ার ডানা ওঠে মরিবার তরে
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছে ঘরে,
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শসী
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে ঊর্বশী।"

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ অংশেও ফুল্লরার প্রতিবাদ অন্যমাত্রা পেয়েছে। সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমনাংশে প্রকাশ পেয়েছে নারীর মর্যাদা রক্ষার অধিকারের লড়াই।

নারীবাদ একান্তভাবে আধুনিককালের ধারণা হলেও সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারী আপনার মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের শক্ত প্রাচীর ভেদ করে সে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি বটে; কিন্তু তারা যে একেবারেই অবলা ছিল না সেকথা স্বতঃসিদ্ধ। প্রাচীন তথা মধ্যযুগের প্রত্যেক সমাজ সচেতন কবির কাব্যেই তাই নারীর মুখে বসানো হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে তার জীবন্ত রূপই ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। Beauvoir Simon de, 'The Second Sex', 1949, vintage classic page-139.
২। Millett Kate, 'Sexual Politics', 1970, Doubleday & Co., Page- 67
৩। 'The Sexual Politics of Meat', Carol J. Adams, Continuum International, 1990, page-32
৪। Plain Gill, 'A History of Feminist Literary Criticism' University of Andrew, Scotland, 2012, page-136.
৫। Moers Ellen, 'Literary Women: The Great Writers', Doubleday, 1976, page-104.
৬। ভট্টাচার্য সাধন কুমার, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও কাব্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২ (৭ম সংস্করণ), পৃঃ-২১৬।
৭। showalter Elain, 'A Literature of their own', Princeton University Press, 1977, page-347.
৮। ভট্টাচার্য আশুতোষ, 'বাংলার লোকসাহিত্য, ক্যালক্যাটা বুক হাউস, ১৯৫৭, পৃঃ-৩৬১
৯। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় সলিল কুমার, রবীন্দ্রসাহিত্য অন্বেষায় লোকসাহিত্য : তথ্য ও মূল্যায়ন, প্রজ্ঞাবিকাশ, ২০০৩, পৃঃ-৭৯।

*****